অন্নদাশঙ্কর ও আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী

আমাদের রাষ্ট্রজীবনে আমরা আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সে সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষতার। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ধর্মনিরপক্ষেতা বা সেকুলারিজম। একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল—তথা সাংস্কৃতিক সংস্থা ভারত রাষ্ট্রের এই আদর্শ ও নীতিগত ভিত্তি উচ্ছেদ করে হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য ব্যস্ত, যদিও বাহ্যত এই উদ্দেশ্য তাঁরা সব সময় ঘোষণা করেন না। তার চেয়েও বড় বিপদ—সব সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রায় অসম্ভব, রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে সেই সহাবস্থান আজ বিপন্ন। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ আজ রাজনৈতিক আবেগের ক্ষেত্রে আর ভেদাভেদমুক্ত রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী নন। সর্ব জাতি, সম্প্রদায়, সংস্কৃতিগোষ্ঠীকে নিয়ে যে বিরাট জাতিকল্পনা আমাদের জাতির পিতারা করেছিলেন জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল আলোয় মহিমান্বিত সেই আদর্শ দীর্ঘদিন আমাদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ তথা আত্মদান করতে প্রেরণা দিয়েছে। দেশবিভাগের সময়কার বীভৎস ভ্রাতৃবিরোধও সেই মহৎ জাতিকল্পনার ভিত দুর্বল করতে পারেনি। জওহরলাল নেহেরু তথা স্বাধীনতার পথিকৃৎ কংগ্রেস পার্টির উপর প্রায় দীর্ঘ দুই দশক দেশবাসীর আস্থাস্থাপন সেই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি জাতির আনুগত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রে রাজনৈতিক পাশা খেলার ফলাফল যাই হোক, আজ জাতীয়তাবাদী আবেগ আমাদের রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রে বিরাজ করছে না।

ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীচেতনা আমাদের বৃহত্তর জাতিকল্পনাকে স্থানচ্যুত করেছে। রাজীব গান্ধি বলেছিলেন, তিনি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্যতর মানুষ। অর্থাৎ তিনি ভারতীয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের বাকি বাসিন্দারা কেউ তামিল, কেউ হিন্দু, কেউ গোর্খা, কেউ অসমিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের বেখেয়ালে কখন যেন ভারতীয় নামক জনগোষ্ঠীটি আমাদের রাষ্ট্রচেতন তথা ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছে গেছে। যে স্বার্থভিত্তিক ভেদবুদ্ধি আমাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, তা আমাদের অনেক চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরই গভীর বেদনার কারণ হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এবং আছেন বেশ কয়েকজন সৃজনধর্মী প্রতিভাবান লেখক। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁদের প্রথম সারির একজন। শুধু চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে নয়, জাতিকল্পনার যে বিশিষ্ট রূপটি তাঁর জীবন-যৌবনকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করেছিল তার পরাজয়ে, এবং সাম্প্রতিক কালে তার বহুমুখী লাঞ্ছনায় তাঁর চেতনা ও সমগ্র সত্তা পীড়িত হয়েছিল। তাঁর সেই যন্ত্রণার কিছু অভিব্যক্তি আজ আমার আলোচ্য। আমার বিশ্বাস, আমরা আজ এক মহতী প্রণষ্টির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি প্রস্তাব করেছেন যে গুজরাত গণহত্যার মহানায়ক নরেন্দ্র মোদীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হোক। অনুরূপ পথেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে হিটলার এবং নাৎসিরা ক্ষমতায় এসেছিল। মনে রাখা ভালো—গুরুজি গোলওয়ালকরের সময় থেকে হিটলার ও নাৎসিবাদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের চোখে সম্মানিত আদর্শ। মনে হয় ফ্যাসিবাদকে আমাদের রাষ্ট্রনীতি করার প্রত্যক্ষ আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই দানবের সঙ্গে সংগ্রামের প্রস্তুতির অপরিহার্য অঙ্গ অন্নদাশঙ্করের মতো স্থিরবুদ্ধি মননশীল মানুষের চিন্তা ও বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর সাবধানবাণী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তথা দেশ বা জাতিচিন্তার সূচনা আঠারো শতকে ফ্রান্সে। তার বাস্তব রূপায়ণ প্রথম ফ্রান্স এবং আমেরিকায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী মার্কিন উপনিবেশগুলিতে প্রধান ধর্মবিশ্বাস খ্রিস্টধর্মের নীতিবাগীশ রূপ, পিউরিটানিজম। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীরা সেই ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেননি। কিন্তু স্বাধীনতা যখন ঘোষিত হল, তখন সেই ইস্তাহারে ধর্মের কোনো উল্লেখ ছিল না। ফ্রান্সে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ ছিল। মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের গোড়ায় রাষ্ট্র ও ধর্মবিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম আন্দোলনের অন্যতর ফল ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট-প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ, আর ফলশ্রুতি হিসাবে রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম হবে এই ভিত্তিতে এক রাজনৈতিক ফয়সালা হয়। আলোকপ্রাপ্ত দর্শন ও চিন্তাধারা ওরফে এনলাইটেনমেন্ট জীবনাদর্শের প্রবর্তক, ধারক ও বাহকরা রাজা তথা ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার প্রথম থেকেই বিরোধী ছিলেন, উভয় শক্তিকেই তাঁরা জনগণের শোষক বলে মনে করতেন। ফলে ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে যাজকতন্ত্রেরও উচ্ছেদ ঘটে। এবং ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ যেখানেই ছড়িয়ে পড়ে সেখানেই রাষ্ট্রনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেন ধর্মনিরপেক্ষতার পথে যায়নি। এখনও ও-দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ রাজা বা রানি অ্যাংলিকান খ্রিস্টান হওয়া আবশ্যিক এবং তাঁর ধর্মই রাষ্ট্রধর্ম। ভারতবর্ষেও ইংরাজ আমলে অ্যাংলিকান চার্চের সাহায্যার্থে একটি সরকারি বিভাগ খোলা হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মুঘল আমলে কোনও ধর্মবিশেষের জন্য আলাদা করে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। ইসলামি শরিয়া ফৌজদারি

আইনের ভিত্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু তার সীমানা নাগরিক জীবনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যেত না। আর রাজা মুসলমান হলেও ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ঘোষিত হয়নি। সীমিত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা আকবরের আমল থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হয়ে পড়ে। মোট কথা এই শিক্ষা আমরা ইংরাজের কাছে পাইনি, কারণ তারা নিজেরাই এখনও নিজেদের জীবনে এই আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। আর আকবরের উদার নীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাও এক বস্তু নয়। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতার দান। সেই অভিজ্ঞতা এবং তার অঙ্গ হিসাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় আমাদের চিন্তা এবং আবেগের জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফল নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা দুই সভ্যতার মিলন নয়, সম্পূর্ণ নতুন এবং পূর্ব উদাহরণ-বিহীন চিন্তা ও প্রচেষ্টার উদ্ভব। আমাদের জাতীয়তাবাদ তথা রাষ্ট্রকল্পনা এই নব নব উন্মেষের কেন্দ্রীভূত। তার তুলনীয় নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এই জাতীয়তাবাদ বা ভারতচিন্তার মূলে রয়েছে এক রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আসমুদ্র হিমাচল এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক জাতিকল্পনা। জাতীয়তাবাদ বা গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম পশ্চিম ইউরোপে। কিন্তু বাস্তবে তার অঙ্গীভূত, ধর্ম বা সংস্কৃতি নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রায় কোথাওই ছিল না। এবং নানা সম্প্রদায়, জাতি তথা ভাষা বা সংস্কৃতিগোষ্ঠী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্রে অংশীদার হবে—এমন প্রচেষ্টাও অভূতপূর্ব।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চিন্তার সূচনা হয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। এবং প্রথমে সেই কল্পিত জাতির সীমানা কী তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের গবেষণালব্ধ তথ্য প্রাচীন ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা নিয়ে গর্বের ভিত্তি স্থাপন করে। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নাটক-উপন্যাসে মুসলমান রাজাদের সঙ্গে মারাঠা বা রাজপুতদের রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ-বিদেশির বিরুদ্ধে হিন্দুর স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই চিত্রিত হতো। বন্দেমাতরম সংগীতে দেশ-মাতার সন্তান সংখ্যা সপ্তকোটি—বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা, কিন্তু তারা দশপ্রহরণধারিণীর পূজক, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় হিন্দু। অথচ বঙ্গদর্শন-এর পাতায় মীর মোশাররফের বিষাদসিন্ধু-র সমালোচনায় দেখি—জাতির নাম হিন্দু বা মুসলমান না, জাতির নাম বাঙালি, লর্ড আমহার্স্টের কাছে চিঠিতে কিন্তু ১৮২৩ সনে রামমোহন India—যা একশো বছর পরে স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এমন এক দেশের উল্লেখ করছেন। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত Indian Association এ কিন্তু ধর্ম-সম্প্রদায়-ভাষাগোষ্ঠী নিরপেক্ষ সর্বভারতীয় জাতি কল্পনা স্পষ্ট এবং নিঃসংশয়। জাতীয় কংগ্রেসে এবং গান্ধির নেতৃত্বে গণ আন্দোলনে একমাত্র সেই ধর্মনিরপেক্ষ জাতিকল্পনাই স্বীকৃত, যদিও খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। যে দ্বিজাতিতত্ত্ব জাতীয়তাবাদীরা কখনও স্বীকার করেননি, তার ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হল, যে কোটি-কোটি ভারতীয় ভগ্নবুকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁদের প্রথম সারিতে অন্নদাশঙ্কর। ওঁর ব্যথাবেদনা বহু রচনায় প্রকাশ পায়। একটি ছেলেভুলানো না বুড়ো চাবকানো ছড়া সর্বজনের মন জয় করে—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো?
তার বেলা, তার বেলা?

স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ। অর্থাৎ কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের এখানে প্রাধান্য নেই, majoritarianism বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এদেশে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। বহু জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা—তথা সংস্কৃতিগোষ্ঠী নিয়ে সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্র তথা জাতি। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও এত সংখ্যক বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক রাষ্ট্রের অঙ্গ হতে রাজি হয়নি। সেই ঐক্য বহু গোষ্ঠীর অসন্তোষে আজ বিপন্ন। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় আজও সেই ঐক্যে বিশ্বাস হারায়নি। ধর্মনিরপেক্ষতা তার অন্যতর কারণ। রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক হলে বা সম্প্রদায়বিশেষকে প্রাধান্য দিলে রাষ্ট্রের প্রতি সংখ্যালঘুদের আনুগত্য বিঘ্নিত হতো। শুধুমাত্র শক্তিপ্রয়োগ করে তাদের আনুগত্য বজায় রাখা সম্ভব হতো না। ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবভিত্তি এই রাজনৈতিক প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রয়োজন এর একমাত্র ভিত্তি না।

জাতীয়তাবাদের শিকড় এক গভীর জীবনধর্মী আবেগে, যা মানুষকে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্রতর স্বার্থবোধের গন্ডি ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর পরিচয়ের অংশীদার করে। মূল্যবোধের দিক থেকে এই উত্তরণ বোধহয় জাতীয়তাবাদের সপক্ষে প্রধান যুক্তি,—যতক্ষণ এই বৃহত্তর পরিচয় আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ না করে। আমাদের এই দেশে গভীর আবেগের আলিঙ্গনে বহু মানবগোষ্ঠীকে একত্রিত করে জাতীয়তাবোধ আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। স্বচ্ছ চিন্তার পাশাপাশি এই আবেগময় দেশপ্রেম অন্নদাশঙ্করের রচনার এক অমূল্য অবদান। সে আবেগের সত্যতা সূক্ষ্ম রুচি—তথা কৌতুকবোধে বিধৃত। তাঁর ভাষা বা ভাব ময়দানি বক্তৃতার না।

অন্নদাশঙ্কর একশোভাগ আধুনিকমনা হলেও ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ—একথার প্রমাণ তাঁর অনেক লেখায় ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী অতএব ধর্মবিশ্বাসী, অবশ্যি অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদীও ধর্মপ্রাণ হতে পারেন। প্রমাণ—বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম বা আজকের মানবতাবাদীরা। সম্পূর্ণ ইহনিষ্ঠ লেখক অন্নদাশঙ্করের চেতনা মিস্টিক বিশ্ববোধে সমৃদ্ধ। তাই তাঁর সেকুলারিজম সম্পর্কে ধারণা এবং গভীর আনুগত্য সংঘ পরিবার-কল্পিত ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতীয় হিন্দু সেকুলারিস্ট বা সিউডো-সেকুলারিস্টের ধর্মবিমুখ ঘৃণ্য মনোভঙ্গি বলে নাক সিঁটকে বরখাস্ত করা চলবে না।

সেকুলার শব্দের অর্থ ধর্ম নিরপেক্ষতা। এ ব্যাখ্যা ওঁর কাছে অগ্রাহ্য ছিল।

কারণ ধর্মে নিরপেক্ষ মানুষেরও একটা ধর্ম থাকে।

খাঁটি সেকুলারিজম অর্থ সর্ব ধর্ম সহিষ্ণুতা তো বটেই, তার চেয়েও কিছু বেশি। উনি লিখছেন,

এ রাষ্ট্র ধর্মের এলাকার বাইরে যারা থাকবে তাদের প্রতিও সহিষ্ণু। এ রাষ্ট্র তাদের নাস্তিক হবার, অজ্ঞেয়বাদী হবার অধিকারও মেনে নেয়। তারা যে যার নিরীশ্বরতায় অবিচল থেকে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় পদে আরোহণ করতে পারে। ভারতবর্ষের অজ্ঞেয়বাদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে এই মন্তব্য স্পষ্টতই প্রযোজ্য। ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি ঈশ্বরের নামে শপথ না নিলে পার্লামেন্টের সভ্য হওয়া যেত না। আজও অ্যাংলিকান না হলে দেশের রাজা বা রানি হওয়া চলে না। অন্নদাশঙ্কর সগর্বে লিখেছেন—

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন কংগ্রেস আমলেরই বিশেষত্ব। এর জন্য আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি।

অন্য দেশ থেকে ঐতিহাসিক নজির টেনে বলেছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ীও রাষ্ট্রপতির ধর্মের কোনও উল্লেখ নেই,

গভর্ণমেন্ট আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তার সন্ধান নেই।

অর্থাৎ যাঁর যে ধর্মে রুচি সে ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন।

ব্যক্তিবিশেষ কোনো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কেউ তা জানতে চায় না। কিন্তু সঙ্গে চেতাবনি জুড়েছেন,

মনে রাখবেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বেলা জানতে চায়, জানে।

কিন্তু অনেক দেশই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও সংবিধানের ললাটে এঁকে দিয়েছে 'ক্যাথলিক' বা 'ইসলামি' বা 'ইহুদী' বা 'বৌদ্ধ'।

ভারতবর্ষ যে ও-পথ নেয়নি সেজন্য উনি শুধু গর্বিত না, আশ্বস্ত। কারণ ওঁর বিশ্বাস ছিল—আমাদের সীমান্ত রক্ষা করছে, শুধু আমাদের সেনাবাহিনী নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা—এই বিশ্বাস যে আমাদের রাষ্ট্র। সব ধর্মের লোকের ও যারা কোনো ধর্ম মানে না তাদের সকলের জাতীয় রাষ্ট্র কারো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। হিন্দুর একার নয়, মুসলমানের একার নয়, শিখের একার নয়, নাস্তিকের একার নয়, সকলের। তাই একে বলা হল সেক্যুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র

কোনো একটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। ধর্ম জিনিসটার সঙ্গেই যুক্ত নয়। অথচ ধর্ম বিরোধীও নয়।

এ সিদ্ধান্তের হেতু? আবার ওঁর ভাষাতেই বলি:

আমরা স্বচক্ষে দেখলাম যে আমাদের দেশ দু-চির হয়ে গেল।....

হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরা, নাগা খ্রিস্টানরা, সিকিমের বৌদ্ধরা সবাই নিজ নিজ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র চাইত।

যে যার ধর্মকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম করতে চাইলে এ দেশ দু-চির কেন চৌচির হবে, চৌচির কেন ছ-চির হবে। এই সর্বনাশা ফাটল দিয়ে আবার বাইরের শত্রু ঢুকবে। স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

ঘটনাচক্রে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে—বিশেষত পাঞ্জাব এবং সিন্ধু অঞ্চলে কার্যত হিন্দু-মুসলমান লোকবিনিময় হয়ে গেছে। হয়েছে অনেক রক্তপাতের মূল্য দিয়ে। এ জাতীয় ফল রাষ্ট্রের আওতায় কোনও ফয়সালা বা বোঝাপড়া মারফত সম্ভব না। মুসলমানরা চলে যাক, এটাই যদি হিন্দুত্বের অন্তরের কথা হতো, তবে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট কলকাতার রাস্তায় কোলাকুলি না হিংস্র আক্রমণের দৃশ্য দেখা যেত। তবে ও দিন যাই ঘটুক, দাঙ্গা বন্ধ হয়নি। অন্নদাশঙ্করের সুচিন্তিত বিশ্বাস ছিল—দাঙ্গার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। কারণ যুদ্ধ কখনও শেষ হয়, শান্তি আসে, শান্তির ছায়ায় সমঝোতা আসে। দাঙ্গার শেষ নেই। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলা, চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া। ওঁর মতে সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু নিরাপত্তা না, পরিপূর্ণ জীবনের গ্যারান্টি। এই নির্দেশের ভিত্তি শুধু রাজনৈতিক সুবুদ্ধি না, গভীর মানবতাবোধ, মানুষের কল্যাণে গভীর আস্থা।

এই প্রসঙ্গে এক মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে উনি আমাদের সচেতন করেছেন। ১২ মার্চ ১৯৬৪ সনে পান্নালাল দাশগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে আমরা পাই:

আমাদের এদিকেই একদল ফ্যাসিস্ট দেখা দিয়েছে।...সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান বলতে এরা বোঝে দাবাখেলায় দু-পক্ষের বোড়েগুলো মেরে নিকাশ করা। এই আসুরিক সমাধানের পিছনেও একপ্রকার লজিক আছে। এরা মাথাওয়ালা লোক। গুন্ডা কিংবা পাগল নয়।

এদের নিরস্ত করতে না পারলে সমূহ বিপদ। অন্নদাশঙ্কর কাদের কথা বলছেন বোঝা কঠিন নয়। তারা পাগল নয় ঠিকই, কিন্তু গুন্ডা নয় বলতে আমি নারাজ। যারা চিত্রকারের ছবি আঁকার, গবেষকের বই লেখার, চলচ্চিত্রকারের ছবি বানানোর অধিকার কেড়ে নিতে ব্যগ্র, তাদের কর্মপ্রণালীকে গুন্ডামি বললে অল্প বলা হয়।

একটি মধ্যযুগীয় তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীয় বিশ্বাস বারবার অন্নদাশঙ্করের রচনায় ধ্বনিত হয়েছে। জয়শ্রী সম্পাদিকা লীলা রায়কে ১৯৬২ সনে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলছেন,

....অনেকের নাম জানি যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছাড়েননি। তাঁরা কোনো কোনো হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ধ্রুবসত্য মনে করেননি, ধ্রুবসত্য হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন।' এই বিশ্বাস বারবার তাঁর বহুমুখী রচনায় ধ্বনিত। বিরোধটা যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক, সাময়িক মিলনটা চিরন্তন, তাই একদিন আমাদের জীবনের কেন্দ্রীয় সত্য বলে প্রকাশ পাবেই।

কোথায় ছিল আরব, কোথায় ছিল তাতার আর তুর্ক, হাবসী আর পাঠান, মঙ্গল তথা মুঘল। আর কোথায় ছিল আর্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হিন্দু। ইতিহাস এদের এমন বেমালুম মিলিয়েছে যে, বিদেশি পোষাক পরলে ও দাড়ি গোঁফ ছাঁটলে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান তা চেনা যায় না।

বাংলার ছিন্নমস্তা রূপ কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। দুস্থ মানুষকে সাহায্য করা মানব ধর্ম। বিপদের মুহূর্তে মুসলমান হিন্দুকে, হিন্দু মুসলমানকে সাহায্য করবে, এটাই আমাদের প্রজাতির স্বভাবধর্ম। দাঙ্গাপীড়িত হিন্দুকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মদান করে ঢাকার আমীর হোসেন চৌধুরী এবং আরও ত্রিশজন পাকিস্তানি মুসলমান এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। সে তুলনায় আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস কিছুটা দরিদ্র। স্বাধীন ভারতে ধর্মান্ধ হিন্দুর হাত থেকে মুসলমানকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন এমন হিন্দুর সংখ্যা মাত্র এক। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো আমরা সব সংখ্যালঘুদের দেশছাড়া করিনি।

অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন—কেন করিনি এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। মুসলমানরা তাদের স্বভূমি তো চেয়েছে এবং পেয়েছে। তবে আর এখানে কেন? ওঁর উত্তর—উভয় রাষ্ট্রে উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব না। কারণ হিন্দু আর মুসলমান—এঁদের একের সর্বনাশে অপরের সর্বনাশ। ওঁর স্থির বিশ্বাস ছিল—যুদ্ধের বা দাঙ্গার প্রতিষেধক শিক্ষা। আশাবাদী, ধর্মনিষ্ঠ মানুষের উপযুক্ত চিন্তা, কিন্তু কথাটা সম্ভবত ঠিক না। নাৎসি ইহুদিনিধন-নীতির সমর্থকদের মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন, গুজরাত-গণহত্যার দার্শনিক তোগাড়িয়া অতি উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, আদবানী এবং মোদীও সম্পূর্ণ নিরক্ষর না, যদিও অশিক্ষিতজনসুলভ বাক্য তাদের মুখে সদাই স্ফুরিত হচ্ছে। শিক্ষা এদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য অনর্থক হিংসাত্মক কাজে মানুষকে প্ররোচনা দিতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত করে না। বরং এরা শিক্ষাকে ধর্মান্ধতার ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে ব্যবহার করতে দলকে প্ররোচিত করেছে। একুশ শতকে এদের কলেজ-শিক্ষিত গুন্ডাবাহিনী দাবি করেছেন—বানররা সমুদ্রে পাথর ভাসিয়ে সেতু তৈরি করেছিল একথা আক্ষরিক সত্য হিসাবে মানতে হবে। ভুলিলে বিপদ হবে।

অন্নদাশঙ্কর বলছেন হিন্দু-মুসলমানের সমানাধিকার আবশ্যিক : এটা কখনও হতে পারে না যে মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দু বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পারে। অথবা হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুসলমান বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পারে। ইতিহাসবিরোধী বিবর্তনবিরোধী এ মতবাদ আমাদের অগ্রগতিকে অতি দীর্ঘকাল ব্যাহত করেছে। হয়ত আরো কিছুকাল করবে। কিন্তু বরাবর করবে না, করতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিষয়ে ওঁর শেষ কথা,—রাজাকে মনে রাখতে হবে তিনি রাজা, রাজা হিসাবে তিনি হিন্দু না, মুসলমান না। সেকুলার রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর এই তত্ত্ব। আমরা নীতিভ্রষ্ট জাতি, কিন্তু এই সুনীতির শেষ রেশটুকু যেন হারিয়ে না ফেলি।

যে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত তা ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে উনি বারবার নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন। সব অহিন্দুদের বহিষ্কার করে কংগ্রেস হিন্দু নেশনের মুখপাত্র হতে রাজি হয়নি। দেশবিভাগ দুই সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া না, দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাকিস্তান লিগের সম্প্রসারণ, ভারত রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের খন্ডিত রূপায়ণ। কায়েদ-এ-আজম জিন্না পাকিস্তানের সবুজ পতাকায় একটি সাদা দাগ বসিয়ে দিয়ে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ স্বীকৃতি, স্পষ্টতই গণমানসে ভিত্তিস্থাপন করেনি। প্রমাণ—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে বছরের পর বছর উদ্‌বাস্তু হিন্দুর ঢল। পাকিস্তান যদি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের একচেটিয়া মাতৃভূমি হয়, তবে অমুসলমানদের সেখানে স্থান কোথায়? ভারতবর্ষের মুসলমান সুলতান-বাদশারাও তাঁদের রাজ্যকে মুসলমানের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে ঘোষণা করতে সাহস পাননি। পাকিস্তান নির্দ্বিধায় এই হঠকারিতা করল। এর পিছনে মুসলিম গণ সমর্থনের প্রমাণ—দাঙ্গা বা মাৎস্যন্যায়ের ফলে যেসব অমুসলমান এদেশে পালাতে বাধ্য হয়, গোলমাল থামলে কেউ তাদের বলল না, এবার ফিরে এসো। হিন্দু-মুসলমান আদি সর্বজাতির রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষ সম্পর্কেও কথাটা সত্যি।

অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন—ধর্মান্ধ রাষ্ট্রনীতির ফলে পাকিস্তান দেশটি কার্যত গণতন্ত্রের গোরস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাকিস্তান বেশিদূর দেখতে পায় না। অদূরদর্শী জননায়কদের হটিয়ে দিয়ে তার মসনদে বসিয়েছেন অদূরদর্শী সেনানায়ক। তা' বলে গান্ধী-নেহেরুর দেশ কি দেখতে পাচ্ছে না যে আন্তর্জাতিক বল পরীক্ষার দিন মাজা ভাঙা মুসলমান তার হয়ে লড়তে পারবে না, ফেরারী মুসলমানকে ডাক দিলে ফেরত পাওয়া যাবে না? লড়াই কি শুধু রণক্ষেত্রে হয়? লড়াই হয় ধানক্ষেত, যেখানে খাদ্য উৎপাদন হয়। লড়াই হয়

তাঁতঘরে আর ওয়ার্কশপে আর কারখানায়, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। মুসলমান না থাকলে লড়াই জোর পাবে না....। ভারতের মুসলমানকে সমান অধিকার দিয়ে ভারতে রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই রাখে।

১৯৬৫ সনে তাঁর একটি লেখায়,—'সমর ও শান্তিতে' পাই, পশ্চিম পাকিস্তানের অদূরদর্শী স্বার্থপরতার ফলে দুই পাকিস্তানে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, ভারতবর্ষ যে প্ররোচনা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি, রাষ্ট্রের এই শুভবুদ্ধিকে উনি অভিনন্দিত করেন। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্ব না মুছে গেলে পূর্ব পাকিস্তান বাঙালিস্থান হবে না, অন্নদাশঙ্কর একথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। ওঁর ভবিষ্যত দৃষ্টিতে দেখা সেই বাঙালিস্থান বা বাংলাদেশ কিন্তু খিড়কির দরজা দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার উদ্যোগ করছিল, ভবিষ্যতে কী আছে তা এখনও স্পষ্ট না।

পাকিস্তানের সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি কখনোই অন্নদাশঙ্করের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সংঘাত অনিবার্য জেনে উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—কোন পক্ষ বেশি বলবান। পাকিস্তান পক্ষে চীন সশরীরে বিদ্যমান, ব্রিটেন অশরীরে বিরাজমান, আমেরিকাও অধিষ্ঠানের আভাস। এছাড়া কয়েকটি মুসলিম দেশও আছে। আর ভারতীয় পক্ষে কে কে? গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, জোট নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রী ধাঁচ। এরা একালের চার মহাশক্তি। এদের শক্তিমত্তার পরিচয় অতগুলো ট্যাংক বা এতগুলো বিমান দিয়ে হয় না। এদের শক্তিমত্তা সূক্ষ্মতর স্তরের ব্যাপার।

অন্নদাশঙ্কর ১৯৬৫-র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আরও লিখেছেন: নৈতিক শক্তি যার যত দুর্বল তার 'moral' তত ভঙ্গুর।.... তার মাজা ভেঙে যায়।.... আমাদের পক্ষের নৈতিক শক্তি চতুষ্টয়ের নাম করেছি। পাকিস্তানের পক্ষে যদি সেরকম কোনো নৈতিক শক্তি থাকত তা হলে পাকিস্তানকে হারানো ঢের বেশি কঠিন হতো কিন্তু তার গণতন্ত্রও নেই, সে ধর্মনিরপেক্ষতায়ও বিশ্বাস করে না, সোজাসুজি ইসলামের দোহাই দিয়ে জেহাদ চালায়।... কাশ্মীরীদের অধিকাংশ মুসলমান, তাই তারা পাকিস্তানকে চায়, এই প্রতীতি তার নৈতিক শক্তি।

দেশবিভাগের একটা দিক অন্নদাশঙ্কর কখনোই মেনে নিতে পারেননি। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি। তাদের দু-ভাগ করা অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ—এই বিশ্বাসে তিনি অচল ছিলেন। উনি লিখেছেন,

বাংলা ও বাঙালির সংজ্ঞা ও সীমা ইতিহাস ও ভূগোল যেভাবে নির্দেশ করে দিয়েছে আমার কাছে সেটা অপরিবর্তনীয়। বাস্তববাদ আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে ওটা এখন পাকিস্তান।.... আমার মন বলে, এই বাস্তবটাই অবাস্তব।.... আমার ইতিহাসবোধ আমাকে বলে যে হিন্দু মুসলমানের তত্ত্বের মামলা তিন চারশ বছর আগেই মিটে গেছে। আলাওল প্রমুখ কবিদের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। এখন যেটা আমরা দেখছি সেটা স্বত্বের মামলা।.... পাওয়ার পলিটিকস।

কায়িক বিচ্ছেদ মানা ছাড়া উপায় নেই বলে মানসিক বিচ্ছেদ মানতে উনি রাজি হননি। ওর গভীর মনোবেদনার প্রকাশ দুটি ছড়ায়—যাদের মূল সুর বেদনাময় ব্যঙ্গ। একটির নাম 'বঙ্গদর্শন'।

এক গালে তোর চুন, ও ভাই
আরেক গালে কালি
এমন করে কে সাজালো
ডান গালী বাঁ গালী
ডান গালী বাঁ গালী ওরে
ডাঙ্গালী বাঙ্গালী
এমন করে কে বানালো
ভিক্ষার কাঙ্গালী।
কে মেরেছে কে ধরেছে
কে দিয়েছে গালি।
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে
সংসার হাসালি।

দ্বিতীয় ছড়াটির নাম 'ঘুঘু-চরানির ছড়া'।

অবাক হতো বিশ্ব যাদের
মেল দেখে
হদ্দ হলো নিত্য নতুন
খেল দেখে।
মাকে নিয়ে ভাগাভাগি
মড়ার মতন রে।
সে যদি বা সত্য হলো
এ কী আজব খেল।
ভায়ের বুকে হানলি সুখে
দারুণ শক্তিশেল।
জানলি না যে বাজল সে বাণ
কার বুকে!
দুই জনারি অভাগিনী
মা'র বুকে।
বুক থেকে মা'র রক্ত ঝরে
স্তন্য কই?
দিকে দিকে শোর উঠেছে
অন্ন কই?
ভাইকে মারে, মাকে কাঁদায়।
তারে বাঁচায় কে।
ভিটাতে যার ঘুঘু চরে
তারে নাচায় কে।

দ্বিধাবিভক্ত বাঙালির পুন র্মিলনের জন্য আকুলতা তৃতীয় এক ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে। নাম 'আড়ি।'

[প্রথম অবস্থা]

চাচা, তোমার সঙ্গে আড়ি
চাচা আর যাব না তোমার বাড়ি
চাচা তোমার মাথা গরম
কথায় কথায় মারামারি
আর যাব না তোমার বাড়ি।
চাচা, তোমার সঙ্গে আমার
চিরদিনের ছাড়াছাড়ি,
আর যাব না তোমার বাড়ি।

[দ্বিতীয় অবস্থা]

এই দুনিয়ায় সবাই ভালো
তুমিই শুধু মন্দ, চাচা
তুমিই শুধু মন্দ।
ভেবেছিলাম তোমার সাথে
মিটল না আর দ্বন্দ্ব।
আসাম গিয়ে এলেম দেখে
বেহার গিয়ে এলেম ঠেকে
সকল দুয়ার বন্ধ, চাচা
সবার দুয়ার বন্ধ।
ভাবছি, চাচা, লোকটা তুমি
এমন কী আর মন্দ।

[তৃতীয় অবস্থা]

চাচা, তুমি ভেজাল দিয়ে
মানুষ মারার কল জানো না
মিষ্টি কথার মুখোশ এঁটে
প্রতারণার ছল জানো না।
বজ্জাতিতে পক্ক বটে
ভন্ডামিতে নেহাৎ কাঁচা
এবার আমি বেশ বুঝেছি
তোমায়-ছেড়ে যায় না বাঁচা।
চাচা, তোমার মনটা সাদা
যে যা বোঝায় তাই তা বোঝো
রাগের মাথায় পাগল হয়ে
মিথ্যে আমার সঙ্গে যোঝো।
নয়তো ভালো তোমার মতো
এই দুনিয়ায় ক'জন আছে।
কেই বা আমায় বাঁচিয়ে রাখে
শস্তা চালে শস্তা মাছে।
চাচা, এবার সন্ধি করে
যাবই যাব তোমার বাড়ি
তোমার বাড়ি বলছি কেন—
তোমার আমার দোহার বাড়ি।

অন্নদাশঙ্কর প্রথমত সাহিত্যিক তথা শিল্পী। তাঁর প্রথম দায়িত্ব নিজের প্রতিভার প্রতি, প্রধান কর্তব্য সাহিত্যিক সৃজন। এ বিষয়ে তিনি অতি সচেতন ছিলেন, তবে কেন তিনি এত সময় এবং শ্রম রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যয় করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন—ব্যক্তি মানুষ প্রথমে মানুষ তারপর আর যা কিছু। যে মানবধর্ম ওঁর দৃষ্টিতে আর সব ধর্মকে ছাড়িয়ে মঙ্গলের পথে আমাদের নিয়ে চলেছে তার রাজনৈতিক প্রকাশ গণতন্ত্র। বহুজাতিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ ধর্মনিরপেক্ষতা। সে নীতি আজ আক্রান্ত, বিপন্ন। এখানে মানুষ হিসাবে শিল্পীর, সাহিত্যিকের প্রথম কাজ রাজনীতির কালিতে কলম চুবিয়ে জনশিক্ষার কর্তব্য পালন—অনন্তকাল না, কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা করা যতদিন নিতান্ত প্রয়োজন ততদিন। আরও আছে। উনি বলেছেন—ধর্মনির্বিশেষে সব ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব জাতীয় কংগ্রেসের কাছে 'নিশ্বাসবায়ুর মতো ছিল', ওঁর কাছে সব ভারতীয় এক জাতির অংশ এ বিশ্বাসও নিশ্বাসবায়ুর মতো, এই অত্যন্ত মার্জিত সূক্ষ্ম রুচিবান নাগরিক গভীর আবেগে প্রায় প্রাকৃত জনের ভাষায় বলেছেন, আমরা এক মায়ের সন্তান। তাঁর আবেগের তীব্রতা বুকভাঙা প্রকাশ পেয়েছে ছোট্ট একটি ছড়ায়—

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো
নজরুল,
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।